১০. গুপ্ত শাসনব্যবস্থা

গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য আহরণের জন্য আমাদের প্রধানত লেখমালা, মুদ্রা ও সীলমোহরের মত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি, নারদ স্মৃতির মত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিও এই যুগ সম্পর্কে আলোকপাত করে। ফা-হিয়েনের বৃত্তান্ত স্মৃতিশাস্ত্রের পরিপূরক।

মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে কিছু প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক ৪০০ খ্রীঃ-এর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। তার স্থলে সর্বত্র রাজতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। গুপ্তরাজগণ সাধারণত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করলেও 'পরমদৈবত', 'পরম-ভট্টারক' প্রভৃতি উপাধির উল্লেখও পাওয়া যায়। রাজার ওপর দেবত্ব আরোপিত হত। তাত্ত্বিক দিক থেকে রাজা সর্বোচ্চ সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রাদেশিক শাসক এবং সব সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী তিনি নিযুক্ত করতেন। বাস্তবে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হত মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা। গ্রামসভা ও নগরের নিগম সভাগুলি স্বায়ত্বশাসন ভোগ করত।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র সাধারণত উত্তরাধিকারী মনোনীত হতেন, অন্যান্য পুত্ররা প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত হত। যুবরাজদের সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী ছিল। তাদেরও শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করতে হত। রাজা বৃদ্ধ বা অসমর্থ হলে যুবরাজ শাসনকার্য দেখাশুনা করতেন। যেমন, কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষদিকে যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের ওপর রাজ্যশাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

রাজা বা যুবরাজের অধীনে সামরিক বিভাগকে রাখা হত। মহাসেনাপতিরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিযুক্ত থাকতেন। তাদের নিচে ক্রমান্বয়ে থাকতেন মহাদণ্ডনায়ক ও দণ্ডনায়ক।

Scanned with CamScanner

পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদেশবিভাগের দায়িত্বে থাকতেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক। একাধিক সান্ধিবিগ্রহিক তাঁকে সাহায্য করতেন। কোনো রাজ্য জয় করা প্রয়োজন, কোনো রাজ্যকে সামন্তরাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হবে তা তিনি স্থির করতেন। পুলিশ বিভাগের প্রধান দণ্ডপাশিক, চাট ও ভাট এই বিভাগের সাধারণ কর্মচারী। রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব ছিল নগদ বা শস্যে কর আদায় করা। খনি ও বনাঞ্চলও এই বিভাগের অধীনে ছিল। নারদ ও বৃহস্পতিস্মৃতি থেকে জানা যায় বিচার বিভাগের উচ্চতম পদে ছিলেন প্রধান বিচারপতি। নগর ও শহরের বিচারকরা ছিলেন তাঁর অধীনে। নালন্দা ও বৈশালীতে প্রাপ্ত ন্যায়াধিকরণ, ধর্মাধিকরণ ও ধর্মশাসনাধিকরণের সীলমোহরগুলি নিম্ন আদালতের অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। ধর্মসংক্রান্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন পুরোধা বা পণ্ডিত। বিনয় স্থিতিস্থাপকের দায়িত্ব ছিল জনসাধারণের নৈতিকতা বজায় রাখা, দানকর্ম ও মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধান করা ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় কুমারামাত্যরা ছিলেন সর্বোচ্চপদের অধিকারী। তাঁরা কখনও মন্ত্রী, কখনও সেনাপতিপদেও আসীন হতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কতকগুলি দেশ ও ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। এগুলি বিভক্ত ছিল প্রদেশ বা বিষয়ে। শুকুলি, সুরাষ্ট্র, দভাল প্রভৃতি দেশ; পুণ্ড্রবর্ধন, বর্ধমান, অহিচ্ছত্র প্রভৃতি ভুক্তি; লাট, ত্রিপুরী, ঐরিরিণ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ গুপ্তলেখতে পাওয়া যায়। ভুক্তির শাসক ছিলেন উপরিক। রাজপুত্ররাও অনেক সময় এই পদে নিযুক্ত হতেন। কুমারামাত্য ও আয়ুক্তের মতো রাজকর্মচারী বিষয়পতি বা জেলাশাসক পদে নিযুক্ত হতেন। ভুক্তি ও বিষয় স্তরের শাসকদের সহায়তা করতেন দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক ও চৌরোদ্ধরণিক প্রভৃতি বিচার ও পুলিশ বিভাগীয় কর্মচারী। বিষয়পতির দপ্তরে পুস্তপাল নামে এক কর্মচারী জমি-সংক্রান্ত দলিলগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করত।

গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রে কোনো মন্ত্রী পরিষদ ছিল কিনা তা জানা যায় না কিন্তু জেলাস্তরে পরিষদের অস্তিত্ব ছিল। এই পরিষদে কুড়িজন সদস্য ছিলেন যাদের বলা হত বিষয়-মহত্তর। এরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। বিভিন্ন পেশার মানুষের নিজ নিজ গিল্ড বা নিগম ছিল। এখান থেকেই শ্রেষ্ঠিন, সার্থবাহ, কুলিক, কায়স্থ প্রমুখ পরিষদের সদস্য হতেন। প্রতিটি বিষয়ের অধীনে কিছু সংখ্যক গ্রাম ছিল। গ্রামেয়ক গ্রাম সভার সাহায্যে গ্রামের তত্ত্বাবধান করতেন। গ্রামসভার সদস্যদের গ্রাম-মহত্তর বলা হত। সাধারণত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই সভায় স্থান পেতেন। নগর প্রশাসনের দায়িত্বে থাকতেন পুরপাল। নিগম-সভার সাহায্যে তিনি পৌরপ্রশাসন পরিচালনা করতেন।

গুপ্ত অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল ভূমিরাজস্ব। একে বলা হত 'ভাগকর', কোথাও কোথাও বলা হত 'উদরঙ্গ'। শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর শুল্ক ধার্য হত। জঙ্গল, খনি, ফেরিঘাট ও বাজার থেকেও কর আদায় করা হত। গুপ্তরাজগণ দেশের সম্পদবৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতেন। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জলসেচ কৃষি উন্নতির সহায়ক হয়। ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের ফলে কৃষি জমির প্রসার ঘটে। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

মৌর্য শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য যেখানে অতি-কেন্দ্রীকতা, সেখানে গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীকতা ও বিকেন্দ্রীকতার মধ্যে এক সুষ্ঠু-সমন্বয়। রাজার হাতে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা থাকলেও অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে সন্নিবিষ্ট রাজধর্মের কাছে তাঁকে দায়বদ্ধ থাকতে হত। প্রাদেশিক, জেলা, গ্রাম ও নগরস্তরের স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে রাজকীয় ক্ষমতা

Scanned with CamScanner

থেকে খ্রীঃ প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী শিল্প-বাণিজ্য ও নগরায়নের চরম বিকাশের যুগ। কিন্তু খ্রীঃ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা দেয় শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা, মুদ্রার অভাব, নগরবসতির ক্রমাবনতি, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি পশ্চাদপদতার লক্ষণ।

আপাতদৃষ্টিতে গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে চিত্র ফুটে ওঠে তার বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। সমৃদ্ধির ফল লাভ করেছিল উচ্চকোটির মানুষ, আপামর জনতা এর সুফল লাভ করেনি। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান বা অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে কৃষির প্রসার ঘটলেও কৃষক করভারে পীড়িত হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকায় মুদ্রা-অর্থনীতির সঙ্কোচন ঘটে, বিশেষ করে বাকাটক অঞ্চলে। কৃষি অর্থনীতি প্রাধান্য পাওয়ায় কারিগরী শিল্প ও ব্যবসার ওপর আঘাত আসে। অর্থনীতি গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ নেই। সেইজন্য সুবর্ণযুগের ধারণা কষ্টকল্পিতই থেকে যায়। কারণ সুবর্ণযুগের আবশ্যিক লক্ষণ হল জনসাধারণের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানোন্নয়ন।

গুপ্তযুগের সাহিত্য ও শিল্প অভিজাতশ্রেণীর বিনোদনের জন্য সৃষ্টি। নাটকের বিষয়বস্তু রাজন্যবর্গের যুদ্ধযাত্রা ও আমোদপ্রমোদ। সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃত অবহেলিত থাকে, উচ্চবর্ণের মানুষ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে। ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের বারমাস্যা স্থান পায়নি। গুপ্তযুগেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যের ফলে বর্ণভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। অন্ত্যজ শ্রেণীর অপবিত্রতা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার প্রচলনের ফলে নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। দাসপ্রথা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায় ।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা দেখিয়েছেন, প্রধানত নিজেদের প্রচারিত লেখমালাতেই শুধু গুপ্তরাজদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে হরিষেণ প্রশস্তিই বিশালতম। অন্যান্য সূত্রে সেরকম নয়। পতনের পর গুপ্তরাজদের হয়ত কেউ মনে রাখত না কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁদের লেখমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী লেখকগণ ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গুপ্তশাসনকেই গৌরবান্বিত করে তোলেন। সেইজন্যই মন্তব্য করা হয়েছে, গুপ্তরাজগণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাননি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদই গুপ্তরাজদের উন্মেষ ঘটায়।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'সুবর্ণযুগ' অভিধার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও গুপ্তযুগে সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তার মধ্যে যে অভূতপূর্ব সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা কম। বস্তুত সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ডে বিচার করলে কোনো সভ্যতা বা যুগকেই 'সুবর্ণ' আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আজ পর্যন্ত কোনো সভ্যতা বা সমাজব্যবস্থাই উচ্চ ও নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে পারেনি। ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা হ্রাস করেছে মাত্র।

Scanned with CamScanner